Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪২তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৬ই আশ্বিন, ১৪৩০ / 24.09.2023

-:- সম্পাদক -:-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
হঠযোগ	শ্রীঅরবিন্দ
যোগবাণী	পরমহংস যোগানন্দ
সাধক রাজা রামকৃষ্ণ	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
স্বামী বিজ্ঞানানন্দের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ	শ্রী প্রণব ঘোষ
পূর্বজের ঋণ	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by
Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.
Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

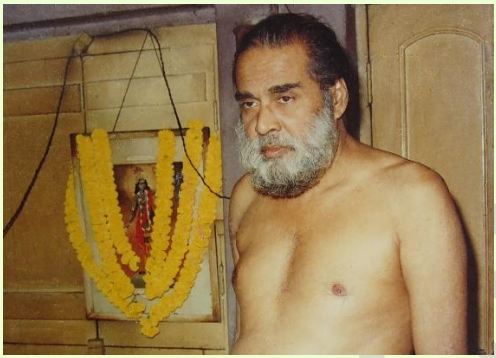

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি কণা

"নিঃস্বার্থ ভাবে, নীরবে কর্ম কর । কি পেলে আর কি না পেলে সে হিসাব কোরো না। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে কর্ম করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।"

DO NOT COPY

মুক্তিনাথ থেকে ফিরে আসবার পর স্বভাবতঃই মুক্তিনাথের বিবরণ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু আমার তো জীবনে গুছিয়ে কাজ করা একেবারেই হয়ে ওঠেনি। তাই ঐ সম্বন্ধে পরপর যে গুছিয়ে লিখব সে সময় একেবারেই নেই, মানসিকতাও নেই। আমার এই অগোছালো ভাবটি শ্রীপ্রীতিকুমারের অনেকটা স্নেহ ও শাসনে ঘেরা ছিল। আমি একটু শান্ত হলে, বাড়িতে কিছুক্ষণ নীরব থাকলে তিনি খুব কৌতূহলী হয়ে উঠতেন।

এর মধ্যে অনেক চিঠি পেয়েছি। এবার নতুন চিঠি শ্রীমতী পারুল রায়ের। কত সুন্দর করে তিনি আমার চিঠির উত্তর দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এবার Camp হল সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনে। শ্রদ্ধেয় শ্রী সুবল বসুর সঙ্গে দেখা করলাম। শ্রদ্ধেয় বিভুদার সঙ্গেও দেখা হল। শ্রী সুবল বসুর ব্যবস্থাপনায় আমি, দীপ্তি ও সাবিত্রী মন্দিরে প্রসাদ পেলাম। ওটা তো ভাগ্যে সবসময় জোটে না। এবার যেটা লাভ হল সেটা হচ্ছে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীকে দর্শন। তিনি আমাদের ফেরান নি। আমরা তাঁকে দর্শন করবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলাম। তিনি তখন Dinner সারছিলেন। খাওয়া হয়ে গেলে আমাদের ডাকলেন। কতো প্রশ্ন করলেন N.C.C. activities নিয়ে। আমাদের Camp Commandant Lt. Col. M. L. Roy সুন্দর করে সব উত্তর দিলেন। আমি স্বামীজীর (যখন Gol Park Institute-এর In-charge ছিলেন) বক্তব্য দু-একবার শুনেছি। মনের গভীরে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। সামনা সামনি কথা বলে যে কি ভালো লাগছিল বলবার নয়। বললাম, "মাথায় একটু হাত দিয়ে দিন।" হেসে খুব স্নেহভরে হাত দিলেন মাথায়। Camp-এ ফিরে এসে মাথা ভারী ভারী লাগছে। মনে হল অত বড় একজন স্বামীজীর হাতের স্পর্শ বলে কি ভারী লাগছে? মনে পড়ল স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর

DO NOT COPY

কথা উঠলে শ্রীপ্রীতিকুমার কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। ভাবলাম হয়তো আমার ছোট্ট আধার ঐ ভার বইতে পারছে না। পরের দিন স্বামীজী আমাদের Camp-এ N.C.C. Cadet দের কাছে কিছু বলতে এলেন। আমরা সবাই লুটিয়ে পড়লাম পায়ে। আবার আমার মাথায় হাত রাখলেন। মনে হল আমার সব বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে। কি সুন্দর করে আমায় আশীর্বাদ করলেন তা বলবার নয়। ওই মুহূর্তটি আমার স্মৃতির মণিকোঠায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এর পর বাড়ি ফিরেই কালীপুজো। শ্রীমান সুনন্দন কালীপুজো করল আবার। ওর ওই কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা উপবাসের বহর দেখে আমার খুব অবাক লাগে। ওর পুরো চল্লিশ ঘন্টার উপবাস কি করে সম্ভব আমার বোধগম্য হয় না। ওর বাবা কিন্তু ঘন্টায় ঘন্টায় চা খেতেন। সুনন্দন চা-ও খায় না। আমি আমার কাজ করে যাই। আগে কালীপুজোর পর দিন স্বামীর পছন্দ মতো পঞ্চব্যাঞ্জন রান্না করে নিয়ে যেতাম। এখন পুত্রের জন্য রান্না করে রাখছি। জানি না পৌত্র কি পদের হবে। তাদের সাথে তো আমাদের কোনও যোগাযোগই নেই। তারা পিতৃহারার মতই প্রতিপালিত হচ্ছে। আমি এখন আর ওসব নিয়ে ভাবছি না। ওসব শ্রীপ্রীতিকুমারের উপর ছেড়ে দিয়েছি। আমার যা কর্তব্য আমি করে যাব।

এবার আমি আরেক স্বামীজী প্রসঙ্গে আসি। তিনি হলেন স্বামী বিবিদিষানন্দজী। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে আমার উপায় নেই। আর কারো মনে আছে কিনা জানিনা, আমার চোখের সামনে ভাসে সেই শান্ত নতমুখী ছেলেটির ছবি। অতীতের দিনগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্বশুর বাড়িতে সবাই একসাথে খেতে বসতেন। শ্রীপ্রীতিকুমার ও শ্রী প্রণব কুমার কতো রকমের গল্প করতেন। কখনও রাজনীতি নিয়ে, কখনও আত্মীয় পরিজন নিয়ে। কিন্তু সেই ছেলেটি কখনও মাথা তুলতো না। শ্রীপ্রীতিকুমার মাঝে মাঝে তাকে ডেকে কিছু আলাপ আলোচনা করতেন। কিন্তু গলা শোনা যেত না ছেলেটির। আমি প্রায় সমবয়সী এই ছেলেটির সাথে খুব বেশী কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু মানসিক ভাবে প্রায় সমবয়সী

বলে একটা শ্রদ্ধা ও মায়ার সম্পর্ক ছিল। তারপর নানা ঘটনার আবর্তে আমরা ভেসে গেছি। সেই স্বামী বিবিদিষানন্দজী মাঝে মাঝে আমাদের বরানগরের বাড়িতে এসেছেন। তখন তিনি সন্ন্যাসী। দমদমের বাড়িতে এলেন আমার এই চরম বিপদের সময়ে। কি ধীর স্থির ভাবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছেন তা বলবার নয়। আমার দীক্ষাগ্রহণ তাঁর কৃপাতেই হয়েছে। জগন্নাথ দর্শন, বিশ্বনাথের পুজো, কুম্ভমেলার স্নান কতো সহজে সাধিত হয়েছে। শ্রীপ্রীতিকুমার যেখানে পৌঁছাতে পারতেন, আমি তা পারি না। আমাকে নিজের মত করেই ব্যবস্থা করতে হয়। অনেকে যখন বলেন, "আপনার তো অমুক জায়গায় জানাশোনা আছে, একটু থাকবার ব্যবস্থা করে দিন না" ... আমি বোঝাতে পারি না যে আমি নিজে সঙ্গে থাকলে যে ব্যবস্থা করতে পারি, চিঠি লিখে পারি না। কারণ আমার সেই ধরণের পরিচিতি নেই। আর আমার পক্ষে কারও কাছ থেকে কারও জন্য কোনও সুবিধা নেওয়া সম্ভব নয়। যখন কেউ নিজে থেকে করেন সে কথা আলাদা।

আবার আসি স্বামীজীর কথায়। পুরীতে একবার একটি শিবলিঙ্গ তাঁর হাত থেকে গ্রহণ করেছিলাম। ডঃ তপন চক্রবর্তীও আমাকে একটি পশুপতিনাথের আকৃতির শিবলিঙ্গ দিয়েছেন। একটি বইতে পড়লাম দুটি শিবলিঙ্গ পূজা করতে নেই। খুব মন খারাপ, আরেকটি শিবলিঙ্গ কোথায় পাই? এবার নেপালে পশুপতিনাথে আমার পুত্তর একটি শিবলিঙ্গ কিনে দিল। হোল তিনটি। মনের সমস্যা দূর হোল। হঠাৎ টেলিফোন – স্বামী বিবিদিষানন্দজী কলকাতায় এসেছেন। ভাইফোঁটার জন্য দুদিন দর্শন করতে যেতে পারলাম না। যেদিন গেলাম, প্রথম প্রাপ্তি শিবলিঙ্গ, দ্বিতীয় প্রাপ্তি স্ফটিকের মালা, তৃতীয় প্রাপ্তি দুর্গাপূজার প্রসাদ। একটি করে জিনিষ দিচ্ছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, আর কি কিছু পাবার ছিল? একটু হাসছেন। শিবলিঙ্গটি দিলেন। আবার হাসি ... আর কি ছিলো? এবার স্ফটিকের মালা। আমার চোখে জল এসে গেল। ছোটবেলায় বাবার কাছ থেকে পেয়ে যেমন আনন্দ হত, ঠিক তেমনই আনন্দ হোল। ভগবান দুঃখীকে ত্যাগ করেন না। আমার দেখা ৩৫ বছর আগেকার সেই ছোট ছেলেটি আমার চোখে বিরাট বড় হয়ে গেল।

এই যে টুকরো টুকরো কথা, টুকরো টুকরো ঘটনা ... এগুলি মানুষের জীবনে এক অমূল্য সম্পদরূপে দেখা দেয়। সব শেষে একটি আপেল দিয়ে বললেন, "এটি শুধু বাপীর জন্য ..."। বাপী অফিস থেকে এসে বললো, "দাও আমার আপেল দাও।" মাঝে মাঝে আমাদের ছেলেটাও আমার চোখে খুব বড় হয়ে যায়। সে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। ঁকালীপূজার পর বাড়ি এসে আমাকে বলল, "তুমি একটা গোটা ফল খাও।" আমার প্রচণ্ড আপত্তি। অর বাবা দিলে খেতাম। ও আবার কোন মুরুব্বি যে ওর দেওয়া আপেল খেতে হবে? কিন্তু না নিয়ে পারলাম না। এবং ধর্মভয়ে হোক, অন্যভয়ে হোক, আপেলটি খেতে হোল। ওর বাবা থাকতে যেমন দুগ্ধপোষ্য ছিল, বাবার অবর্তমানে একদম ইস্পাতের মত হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আমার সাথে প্রচণ্ড রাগারাগি হয়। কিশোর বলে, "মনে হয় একজন খুন হয়ে যাবে," – কিন্তু কেউই খুন হই না। আবার মিটমাট হয়ে যায়। কারণ আমাদের তো আর কেউ নেই কাছাকাছি। শ্রীপ্রীতিকুমার থাকতেও এমন ঝগড়া হত। আমি অভিযোগ করলে মুচকী হেসে বলতেন, "কি করব বলো? তোমার পক্ষ নিলে ও ভাববে স্ত্রীকে support করছে, আবার ওর পক্ষ নিলে তুমি ভাববে ছেলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে। তাই চুপ করে থাকি। ....." তবে শেষের দিকে বলেছিলেন, "বাবু, মা যাই হোক না কেন তাকে আঘাত দিতে নেই। ..... " আমার পুত্তর স্বার্থে লাগলে সে কথা ভুলে যায়। আমিও ছাড়নেওয়ালী নই। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাই। তবে এখন মোটামুটি সব কিছু সয়ে গেছে। শ্রীপ্রীতিকুমারের আশীর্বাদে আমরা শান্তই আছি।

একটি জিনিষ লক্ষ্য করলাম, কোনও মূর্তি বা ফটো বাপী ওর বাবার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের আসনে রাখতে দেয় না। স্বামী বিবিদিষানন্দজীর দেওয়া শিবলিঙ্গ ও স্ফটিকের মালা ওর বাবার ফটোর সামনে সারারাত রইলো। আমি পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। আগে যখন দুটি শিবলিঙ্গ ছিল স্বামী বিবিদিষানন্দজী বলেছিলেন, "একটি গঙ্গায় দিয়ে দিন।" পারিনি যদি কোন বিপদ ঘটে সেই ভয়ে। আমার অশান্তিতে পশুপতিনাথে বাপী একটি নর্মদার শিব (অন্ততঃ দোকানদারের ভাষায় তাই) কিনে দিল। এদিকে বারাণসী থেকে স্বামী বিবিদিষানন্দজী আবার একটি শিবলিঙ্গ এনে

দিলেন। আমার হয়ে গেল চারজন। সেই পুরাতন সমস্যা! এবার নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করলাম। শ্রীপ্রীতিকুমারকে আমি পঞ্চম শিব করে বসিয়ে দিলাম। আর সমস্যা নেই। আমি এখন প্রতিদিন পঞ্চ শিবের পূজা করছি। এমনিতে বলে "একা রামে রক্ষা নেই, লক্ষ্মণ দোসর!" এই পঞ্চ শিবও আমার ধৈর্যের পরীক্ষা করছেন।

শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে বলতেন, "তোমার কোনও পুজো করতে হবে না। আমি যা করেছি তোমার পর সাতপুরুষের আর কোনও পুজো করতে হবে না।" তবু আমি পূজা করি। শিব আমার বরাবরই খুব পছন্দের ব্যক্তি। তাই তাকে পূজা করতে আমার বেশ ভালোই লাগে। তবে দেরি হয়ে গেলে শ্রীপ্রীতিকুমারের কপালে 'ঠকাস' শব্দে যে চন্দনের ফোঁটাটি পড়ে, তাতে ভদ্রলোকের বোধহয় সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগে। আমার মত একটি নাস্তিক মহিলার হাত থেকে প্রতিনিয়ত একটা ফোঁটা পাচ্ছেন, এটা তাঁর পক্ষে চিন্তা করা কঠিন বৈকি!

দিন কেটে যাচ্ছে। সমস্ত উত্তেজনা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে। এখন আর শূন্য ঘরে প্রাণপাখী ছটফটিয়ে ওঠে না। মনে হয় কোনও এক ধ্যানমগ্ন আত্মার খুব কাছে বসে আছি। তিরিশটা বছর কত অবহেলায় কাটিয়ে দিয়েছি। এমন একজন মহাপুরুষের ঘরণী হয়েও বিশ্বের উপকার তো করতে পারিই নি, নিজের উপকারও করতে পারি নি।

আজ একটা কথা বলতে পারি, তিনি কিন্তু আমাকে ত্যাগ করেন নি। আমার প্রতিটি কর্মে তাঁর সহায়তা আছে, তাঁর আশীর্বাদ আছে। তাঁর নির্দেশনা তাঁর অনুপ্রেরণা কাজ করছে। তাই আজও আমি পথ চলতে পারছি। জীবনে চরম অন্যায় করেছি একটি শিশুর প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়ে। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর সেই শিশুটিকে আমি একটি রাত্রের জন্য কাছ ছাড়া করিনি। সারা পৃথিবী একদিকে, সেই শিশুটি আমার দিকে। শ্রীপ্রীতিকুমারও দূরের হয়ে গেছিলেন। তাঁকে বেশি যত্ন করতে পারিনি। সেই অন্যায় আমার। তিনি অভিমান করেছেন কিনা জানিনা, নীরব

থেকেছেন। শিশুটি তাঁরও চোখের মণি ছিল। কিন্তু তিনি সামঞ্জস্য বজায় রাখতেন। আমার কাছে শিশুটি সর্বস্ব ছিল। শ্রীপ্রীতিকুমার চলে গেলেন। শিশুটি কাছ ছাড়া হোল পঞ্চম দিনে। তার সাথে আমার আর দেখা হয় নি। একটা ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত আসবে। ..... কিন্তু চার বছর অতিক্রান্ত প্রায়। আজ আর আশা করি না। আজ আমি শ্রীপ্রীতিকুমারের অনেক কাছের লোক। তিনি তাঁর সেই স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছেন।

- - - - - - - -

(** রচনাকাল - নভেম্বর, ১৯৯০)

হঠযোগ **শ্রীঅরবিন্দ**

যোগের যত বিভিন্ন পথ আছে প্রায় ততগুলি পথ আছে সমাধিতে উপনীত হবার। সমাধির উপযোগিতার উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে শুধু যে উচ্চতম চেতনায় উপস্থিত হবার প্রধান উপায় হিসাবে তাই নয়, পরন্তু সেই উচ্চতম চেতনারই শর্ত বা অবস্থা হিসাবে, সমাধিমগ্ন হয়ে ঐ চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার এবং দেহের মধ্যে থেকেই উপভোগ করা যায়; তাই কয়েকটি যোগ পদ্ধতিকে কেবলমাত্র সমাধিতে যাবার উপায় স্বরূপই মনে হয়। প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক যোগ পদ্ধতিই পরমের সহিত যুক্ত হবার প্রয়াস এবং তাঁহার সহিত মিলন উপলব্ধিই সকল যোগের লক্ষ্য। পরমাত্মার সহিত যোগ, পরমচেতনার সহিত মিলন, পরমানন্দের উপলব্ধি – অথবা, যদি আমরা সমগ্রভাবে একত্বের ধারনার প্রতিবাদ করি তাহলে অন্ততঃ কোনও একরকমের যোগ আত্মার ভগবৎ অবস্থায় বা ভগবৎ সত্তার মধ্যে বাস (সালোক্য), অথবা একরূপ অভেদ্য নৈকট্যে স্থিতি (সামীপ্য)। উহা লাভ করা যেতে পারে কেবলমাত্র আমাদের সাধারণ মনের অতীত চেতনার উচ্চতর স্তরে এবং প্রাখর্যে উন্নীত হয়ে। সমাধি ঐরূপ উচ্চতর স্তর এবং উজ্জ্বলতর প্রাখর্যের

DO NOT COPY

স্বাভাবিক অবস্থা। জ্ঞানযোগে স্বভাবতঃই সমাধি খুব উচ্চস্থান অধিকার করে, কারণ জ্ঞানযোগ পদ্ধতির মূলনীতি এবং লক্ষ্যই হোল মানসিক চেতনাকে এক উজ্জ্বল ও একাগ্র শক্তিতে পরিণত করা যার সাহায্যে সত্য সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে তাহার সহিত একীভূত হয়ে তাহার মধ্যে নিজেকে হারাতে পারা যায়। আরও দুইটি মহান যোগ পদ্ধতি আছে যেথায় সমাধির প্রাধান্য আরও অধিক। এই দুইটি পদ্ধতি হোল রাজযোগ এবং হঠযোগ। ইহাদের সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করবো। যদিও জ্ঞানযোগের পদ্ধতি এবং ইহাদের পদ্ধতির মধ্যে অনেক তফাৎ, তথাপি ইহাদের মধ্যে এই একই নীতি রয়েছে। তবে ইহাদের পদ্ধতির আন্তরিক সত্যের উপর ভাসাভাসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আমরা সন্তুষ্ট থাকবো। কারণ আমাদের সমন্বয়কারী পূর্ণযোগের পদ্ধতিতে ইহাদের প্রাধান্য গৌণ। তাহাদের লক্ষ্য আমাদেরও লক্ষ্য। কিন্তু উহাদের নিয়মকানুন আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারি, অথবা প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা এবং সাময়িক সাহায্যরূপে ব্যবহার করতে পারি।

হঠযোগের পদ্ধতি খুব শক্তিশালী, কিন্তু ইহা দুরূহ এবং ক্লেশজনক। ইহার কর্মনীতির ভিত্তি হোল আত্মা এবং দেহের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপিত করা। দেহই হোল চাবিকাঠি। বন্দীত্ব এবং মুক্তি, এই দুইয়েরই রহস্য লুকান আছে দেহের মধ্যে। ইহার মধ্যে রয়েছে জান্তব দুর্বলতা এবং দিব্যশক্তি। মন এবং আত্মাকে দেহই অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, আবার ওদিকে আলোকিতও করে। দেহই আমাদিগকে বেদনার অধীন করে এবং সীমিত করে, ইহাই আবার আত্ম-প্রভুত্ব দান করে। দেহই আনে মৃত্যু এবং দেহের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে অমরতার রহস্য। হঠযোগীর দৃষ্টিতে দেহ শুধু একটি জীবন্ত জড় পিণ্ড নয়, ইহা স্থূল সত্তা ও পরমাত্মার মধ্যে স্থিত এক অলৌকিক সেতু। এমনও দেখা গেছে যে হঠযৌগিক পদ্ধতির বিচক্ষণ কোনও ব্যাখ্যাকার বেদান্তের প্রতীক চিহ্ন ওম্ টিকে এই অলৌকিক দেহেরই আকৃতিরূপে বর্ণনা করেছেন। যদিও হঠযোগী সব সময়েই স্থূল দেহ সম্বন্ধেই কথা বলেন এবং উহাকেই যোগ সাধনার ভিত্তি করেন, তথাপি তিনি শরীরতত্ত্ববিদ্ বা শরীর ব্যবচ্ছেদকারীর দৃষ্টি নিয়ে দেহকে দেখেন না। তিনি ইহার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দেন

এমন ভাষায় যা স্থূল শরীরের পশ্চাতে স্থিত সূক্ষ্ম শরীরকেই নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দৃষ্টি নিয়ে হঠযোগীর সমগ্র লক্ষ্যকে অল্পকথায় বলা যায় যে ইহা একটি প্রয়াস মাত্র যা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মে দেহ মধ্যস্থ আত্মাকে দেয় শক্তি, আলো, পবিত্রতা, স্বাধীনতা, ক্রমোন্নতিশীল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, যা আত্মার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় যদি সে সূক্ষ্ম এবং উন্নত কারণ আধারে বাস করে। তবে হঠযোগী হয়ত ঐরূপ ভাষায় ইহার বর্ণনা দেবেন না।

হঠযৌগিক পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক বলাতে হয়তো অনেকে আশ্চর্য হবেন যাদের ধারণা বিজ্ঞান শুধু স্থূল জগতের বাহ্যিক ঘটনা সমূহেরই সহিত যুক্ত এবং ইহা বিশ্বাতীত জ্ঞান থেকে পৃথক। হঠযোগ নির্ধারিত নিয়ম এবং কর্ম পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং যথাযথভাবে অভ্যাস করলে সুপরীক্ষিত ফললাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে, হঠযোগ তার নিজস্ব ধারায় জ্ঞানেরই একটি পদ্ধতি, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানযোগ হল সত্তার দর্শন জ্ঞান যা আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত, ইহা একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি, আর হঠযোগ হোল সত্তার বিজ্ঞান; ইহা দৈহিক মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। উভয়েই দৈহিক, আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক ফলদান করে, কিন্তু যেহেতু উহারা একই সত্যের বিভিন্ন মেরুতে স্থিত, সেইহেতু একটির কাছে দৈহিক মনস্তাত্ত্বিক ফলের মূল্য খুব কম, খাঁটি মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যত্মিক ফলই জ্ঞান যোগের লক্ষ্য, এমনকি খাঁটি মনস্তাত্ত্বিক ফলও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সাহায্যকারী রূপেই গৃহীত হয়, একমাত্র আধ্যাত্মিকতাই জ্ঞানযোগীর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে। হঠযোগে দেহকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, মনস্তাত্ত্বিক ফলেরও মূল্য যথেষ্ট, এবং আধ্যাত্মিক ফলই সর্ব্বোচ্চ এবং শেষ পরিণতি। তবে হঠযোগে আধ্যাত্মিকতাকে দীর্ঘকাল যাবৎ দূরে সরিয়ে রাখা হয়, কারণ দেহই দাবী করে সর্বগ্রাহী একাগ্রতা। ইহা ভোলা উচিত নয় যে যোগের এই দুইটি পদ্ধতির লক্ষ্য একই। হঠযোগও পরম ব্রহ্মে উপনীত হবার একটি পথ, যদিও ইহার পদ্ধতি দুরূহ, শ্রমসাধ্য, দুঃখম্ অন্তম্।

যোগের প্রত্যেকটি পদ্ধতিই সাধনার তিনটি নীতি অনুসরণ করে, প্রথমতঃ পবিত্রকরণ অর্থাৎ আমাদের সত্তার দৈহিক, নৈতিক এবং মানসিক কর্মেন্দ্রিয় শক্তির

মিশ্রিত ও অনিয়মিত ক্রিয়া থেকে সর্ব রকমের চ্যুতি, বিশৃঙ্খলতা এবং বাধাবিপত্তির অপসারণ, দ্বিতীয়তঃ, একাগ্রতা অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আমাদের সত্তার শক্তিকে তার পূর্ণ তেজে আনয়ন করা এবং তাকে কর্তৃত্বপূর্ণ আত্মচালিত কর্মে নিয়োগ করা, তৃতীয়তঃ মুক্তি, অর্থাৎ আমাদের সত্তাকে এই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত শক্তির যন্ত্রনাদায়ক গ্রন্থী থেকে ত্রাণ করা, আমাদের প্রকৃতির বর্তমান নিয়মানুসারে এই শক্তি মিথ্যা এবং সীমাবদ্ধ খেলাতেই নিযুক্ত। আমাদের মুক্ত সত্তার আনন্দই শেষ সিদ্ধি, ইহাই পরম ব্রহ্মের সহিত আমাদের একত্ব বা মিলন আনয়ন করে, ইহার জন্যই সাধনা। ইহাই তিনটি অপরিহার্য্য ধাপ এবং উচ্চ, উন্মুক্ত অন্তহীন স্তর, যেথায় তারা উঠছে। হঠযোগের সকল অভ্যাস প্রণালী ঐ লক্ষ্যকেই স্থির রেখেছে।

হঠযোগের দৈহিক অনুশীলনের দুইটি প্রধান অঙ্গ আছে; অন্যান্যগুলি ইহাদেরই সাহায্যকারী মাত্র; একটি হোল আসন; দেহকে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট অবস্থায় স্থির নিশ্চল হয়ে থাকতে অভ্যাস করান, অন্যটি প্রাণায়াম, দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির স্রোতকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাবে চালনা ও ধারণ করা। দেহ সত্তাই যন্ত্র, ইহা দুইটি উপাদানে গঠিত, জড় আর প্রাণ। দেহই বাহ্যিক যন্ত্র বা ভিত্তি আর প্রাণশক্তি হোল শক্তিস্বরূপে প্রকৃত যন্ত্র। জড়দেহ এবং প্রাণশক্তি, এই দুইটি যন্ত্রই এখন আমাদের কর্তা। আমরা দেহের অধীন, আমরা প্রাণশক্তির দাস, যদিও আমরা আত্মা, মনোময় সত্তা, তথাপি নিতান্ত অল্প পরিমাণেই আমরা উহাদের উপর প্রভুত্ব করতে সক্ষম হই, অকিঞ্চন এবং অসীম বাস্তব প্রকৃতির দ্বারা আমরা সীমাবদ্ধ। এবং সেই কারণেই সামান্য এবং গণ্ডীবদ্ধ প্রাণশক্তির দ্বারা আবদ্ধ; এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণশক্তিকেই আমাদের দেহ ধারণ করে রাখতে এবং সঞ্চারিত করতে সক্ষম। অধিকন্তু, আমাদের মধ্যে ঐ দুইয়ের কাজ শুধু যে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ তাই নয়, পরন্তু উহারা অপবিত্রতার অধীন এবং যতবারই পবিত্র করা যায় উহারা পুনরায় অপবিত্র হয়ে যায় এবং সর্ব রকমের বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ থাকে; কতকগুলি আমাদের সাধারণ দৈহিক জীবনের অন্তর্গত উহাদের স্বভাবগত জোরাল বিশৃঙ্খলা; অন্যগুলি অস্বাভাবিক দৈহিক ব্যাধি এবং অসুস্থতা। হঠযোগকে ঐ সকল

সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়; উহাদের সমাধান করতে হয়। প্রধানতঃ, আসন এবং প্রাণায়ামের সাহায্যেই হঠযোগ তাহা করে, পদ্ধতি দুটি জটিল এবং ক্লেশকর, কিন্তু নীতি হিসাবে উহারা সরল এবং ফলদায়ী।

হঠযোগের আসন পদ্ধতির মূলে দুইটি গভীর প্রত্যয় আছে যারা অনেক ফলপ্রসূ তাৎপর্য্য আনয়ন করে। প্রথমটি হোল নিশ্চলতার দ্বারা দৈহিক সংযম। দ্বিতীয়টি হোল নিশ্চলতার সাহায্যে শক্তি বর্ধন। দৈহিক স্থিরতা হঠযোগে বিশেষ প্রয়োজন, যেমন জ্ঞানযোগে মানসিক নিশ্চলতা প্রয়োজন; উভয়ক্ষেত্রে কারণ একই। অনভ্যস্ত মন, যা আমাদের সত্তার এবং প্রকৃতির গভীরতর সত্যের সহিত পরিচিত নয়, তার কাছে বোধ হতে পারে যে ঐ দুইটি যোগপদ্ধতির লক্ষ্য হোল নিষ্ক্রিয়তা এবং তামসিকতা। প্রকৃত সত্য ঠিক তার বিপরীত। কারণ দৈহিক বা মানসিক যৌগিক নিষ্ক্রিয়তা হোল একটি অবস্থা যার সাহায্যে অধিকতম পরিমাণে শক্তিকে বর্ধিত, অধিকৃত, ধৃত করা সম্ভব হয়। আমাদের মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া একটি বিশৃঙ্খল চাঞ্চল্য মাত্র, অপচয় পরিপূর্ণ, অনিশ্চিত প্রচেষ্টায় সত্ত্বর শক্তিক্ষয় হয়, যার অল্প পরিমাণই ব্যবহৃত হয় কর্তৃত্বপূর্ণ সঙ্কল্পের দ্বারা - এখানে অপচয়ের অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির অপচয় নয়, কারণ আমাদের চোখে যাহা অপচয় বিশ্বপ্রকৃতির কাছে তাহাই মিতব্যয়িতা। আমাদের দেহের ক্রিয়াকর্মও ঐরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ।

আমাদের দেহের দুর্বলতার একটা চিহ্ন এই যে সামান্য মাত্র সীমিত শক্তি যা ইহার মধ্যে আসে বা তৈরী হয় তাহাকেও সে ধারণ করতে অক্ষম, তাই এই প্রাণিক শক্তির অপচয় সাধারণ ভাবেই হয়। কেবলমাত্র ন্যূনতম অংশই সুনিয়ন্ত্রিত ও মিতব্যয়িতার সহিত ব্যবহৃত হয়। দেহের মধ্যে যে প্রাণ শক্তি সাধারণতঃ কাজ করে এবং বাহির থেকে যে-সব শক্তি তাহার উপর ক্রিয়া করে যে সব শক্তি অন্যান্য ব্যক্তি থেকেও আসতে পারে অথবা চতুর্পার্শে সক্রিয় সাধারণ প্রাণিক শক্তিও হতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে আদান প্রদান এবং ঘাত প্রতিঘাতের ভারসাম্য সতত রক্ষা করা অনিশ্চিত, উহা যে কোনও মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি বাধা ত্রুটি,

অমিতব্যয়িতা, বিকৃতি সৃষ্টি করে অপবিত্রতা এবং বিশৃঙ্খলা। স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলে প্রকৃতি সব কিছুকে তার নিজস্ব উদ্দেশ্য অনুযায়ী বেশ ব্যবস্থা করে নিতে পারে। যে মুহূর্তে মানুষের ভ্রমাত্মক মন এবং ইচ্ছা প্রকৃতির অভ্যাসগত কর্মে, তার প্রধান প্রবৃত্তি এবং সহজ প্রেরণার পথে বাধা সৃষ্টি করে, এবং বিশেষভাবে যখন মন ও প্রাণ, মিথ্যা বা নকল অভ্যাসের সৃষ্টি করে তখন এই অসামঞ্জস্য বৃদ্ধি পায় এবং বিশৃঙ্খলতাই সত্তার সাধারণ নিয়ম হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐরূপ বাধা উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য, কারণ মানুষ তার প্রাণ প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই জীবন ধারণ করে না; মানুষের জীবনের লক্ষ্য উচ্চতর; প্রথম সঙ্গতিতে প্রকৃতি ঐ উচ্চতর লক্ষ্যকে দেখতেই পায় নাই, তাই তার কার্যাবলীকে ঐ লক্ষ্যের অনুযায়ী পরিচালিত করা এখন তার পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছে। সুতরাং, উচ্চতর অবস্থা বা কর্মের জন্য প্রথমতঃ চাই এই বিশৃঙ্খলা ও চাঞ্চল্য থেকে মুক্তিলাভ করে সকল ক্রিয়াকে স্থির এবং নিয়ন্ত্রিত করা। হঠযোগীকে নিয়ে আসতে হয় দেহের এবং প্রাণশক্তির এক অপ্রাকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা এবং ক্রিয়া; তবে ইহা বৃহত্তর বিশৃঙ্খলার অপ্রাকৃত অবস্থা নয়, পরন্তু তাহা এক উচ্চতর অবস্থা এবং পূর্ণতর আত্ম-কর্তৃত্ব।

আসনের নিশ্চলতার প্রথম উদ্দেশ্য দেহের মধ্যে যে চাঞ্চল্য আরোপ করা হয়েছে তার থেকে মুক্তিলাভ, এবং দেহকে অভ্যস্ত করান যাতে সে ক্ষয় বা অপচয় না করে প্রাণিক শক্তিকে ধারণ করতে পারে। আসন অভ্যাস করবার সময় তামসিকতার দ্বারা শক্তি লোপ পাচ্ছে বা তার হ্রাস হচ্ছে এমন অভিজ্ঞতা হয় না বরঞ্চ প্রভূতভাবে শক্তি বর্ধিত হচ্ছে, ভিতরে প্রবেশ করছে, সঞ্চালিত হচ্ছে এইরূপ অনুভূতিই হয়। দেহ সাধারণতঃ তার আন্দোলনের দ্বারা উদ্বৃত্ত শক্তিকে ক্ষয় করতেই অভ্যস্ত, সুতরাং এই বর্ধিত এবং আধৃত আন্তরিক ক্রিয়াকে সে প্রথম প্রথম সহ্য করতে পারে না, এবং জোর কম্পনের দ্বারা তার অক্ষমতা প্রকাশ করে, ক্রমে ক্রমে সে অভ্যস্ত হয়, এবং যখন আসনটি আয়ত্তাধীন হয় তখন ঐ আসনে দেহ সেইরূপ আরাম বোধ করে, যেমনটি তার সহজভাবে উপবেশন করায় বা অর্ধশয়ান অবস্থায়, যদিও প্রথম প্রথম ঐ আসনটি কঠিন এবং অস্বাভাবিক মনে হয়। যত অধিক

পরিমাণে শক্তি দেহের মধ্যে আনীত হোক না কেন দেহ তাহা ধারণ করতে ক্রমশঃই অধিকতররূপে সক্ষম হয়, এবং অঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা শক্তিকে বাইরে নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় না, তখন ঐ শক্তি এতই বেশী বর্ধিত হয় যে উহাকে অসীম মনে হয়। তাই সিদ্ধ হঠযোগী যে গুণ ও শক্তি দেখাতে পারেন, অক্লান্ত ভাবে যেমন শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন তেমনটি মানুষের সর্বোচ্চ সাধারণ দৈহিক শক্তিও দেখাতে অক্ষম। কারণ দেহ যে কেবলমাত্র ঐ শক্তিকে ধারণ এবং রক্ষণ করতে পারে তাই নয়, উপরন্তু দৈহিক পদ্ধতিকে উহার অধীনস্থ করে এবং দেহের মাধ্যমে ইহার পূর্ণতর ক্রিয়াকেই সহ্য করে। এইরূপে প্রশান্ত এবং নিষ্ক্রিয় দেহের মধ্যে শক্তিশালী এবং একমুখী হয়ে প্রাণিক তেজ আধৃত শক্তি এবং আধেয়র মধ্যে অনিশ্চিত সাম্যভারকে নিশ্চিত করে অনেক অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ক্রিয়াশীল হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন মনে হয় শক্তিই যেন দেহকে ধারণ করে রেখেছে, অধিকার করেছে এবং ব্যবহার করছে, শক্তি যেন নিজে আধৃত, অধিকৃত বা ব্যবহৃত হচ্ছে না। ঠিক যেমন চঞ্চল ও সক্রিয় মনের মধ্যে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি আসে সেগুলিকে সে অসঙ্গত এবং অনিয়মিত ভাবে গ্রহণ করে ব্যবহার করছে এইরূপ মনে হয়, - অথচ প্রশান্ত মন আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ধৃত, অধিকৃত এবং ব্যবহৃত হয়।

ঐভাবে দেহ নিজস্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, বহু অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলা থেকে পবিত্র হয়ে, আংশিকভাবে আসনের দ্বারা এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাণায়াম এবং আসন এই যুগ্ম পদ্ধতির দ্বারা একটি নিখুঁত যন্ত্রে পরিণত হয়। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ার অভ্যাস থেকে দেহ মুক্ত হয়, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর গতি অবরুদ্ধ হয়। সাধারণ মানব জীবনের আয়ু অতিক্রম করেও হঠযোগী তাঁর শরীরে অক্ষুন্ন শক্তি, স্বাস্থ্য এবং জীবনের যৌবন রক্ষা করেন, এমনকি দেহের তরুণ আকৃতিও দীর্ঘকাল যাবৎ রক্ষিত হয়। হঠযোগীর আয়ু বহু দীর্ঘ হয়। হঠযোগ শাস্ত্র অনুযায়ী মানবদেহ একটি অপরিহার্য্য যন্ত্রস্বরূপ, সুতরাং ইহাকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা এবং দোষ ত্রুটি শূন্য রাখার মূল্য মোটে তুচ্ছ নয়। ইহা লক্ষ্যণীয় যে হঠযোগে

বহুসংখ্যক বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতির আসন আছে, পূর্ণসংখ্যা আশিরও বেশি, এবং উহাদের কয়েকটি খুবই জটিল এবং দুরূহ। নির্দিষ্ট ফললাভের জন্য বিশিষ্ট ধরণের আসন করা প্রয়োজন, ব্যবহারের উপযোগী নমনীয়তা এবং স্বাধীনতা দেহের থাকা প্রয়োজন। দেহের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার সহিত মৃত্তিকার শক্তির সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন করবার জন্য বিভিন্ন আসনের প্রয়োজন। দেহকে ভারমুক্ত করা চাই, তার প্রথম লক্ষণ ক্লান্তির উপর বিজয় লাভ এবং শেষ নিদর্শন আংশিকভাবে দেহকে শূন্যে উত্তোলন। স্থূলদেহ সূক্ষ্ম দেহের কিছু প্রকৃতি লাভ করে এবং প্রাণশক্তির সহিত কিছু সম্বন্ধও অর্জন করে, উহা বৃহত্তর শক্তিতে পরিণত হয়, এবং বেশি তেজশালী রূপেই অনুভূত হয়, তথাপি লঘুতর, মুক্ত এবং নিশ্চিত রূপেই কর্মক্ষম হয়। ঐ সমস্ত শক্তিই হঠযোগের সিদ্ধিতে পরিণত হয়, অর্থাৎ গরিমা, মহিমা, অনিমা এবং লঘিমার অসাধারণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জীবনের ক্রিয়াও তখন আর সম্পূর্ণ রূপে দৈহিক যন্ত্র গুলির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, যেমন হৃদ্‌পিণ্ডের গতি, শ্বাস প্রশ্বাস। এই সব ক্রিয়াকেও শেষে বন্ধ করে দেওয়া যায়, অথচ প্রাণের সঞ্চালন তাতে বন্ধ হয় না, ছিন্নও হয় না।

ঐ সমস্ত ফললাভ হয় নির্ভুলভাবে আসন ও প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা এবং উহারা মূলতঃ বাস্তবশক্তি এবং স্বাধীনতা। হঠযোগের উচ্চতর উপযোগিতা একান্তভাবে নির্ভর করছে প্রাণায়ামের উপর। সমগ্র জড় দেহের স্থূলতর ভাগটি নিয়েই আসন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে নিবদ্ধ। যদিও আসনে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রাণায়ামের সাহায্য প্রয়োজন। আসনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দৈহিক নিশ্চলতা এবং আত্মধৃতি থেকে যাত্রা করে প্রাণায়াম সাক্ষাৎ ভাবে সূক্ষ্মতর প্রাণিক অংশ, স্নায়বিক পদ্ধতির উপরই কাজ করে। প্রাণায়ামে শ্বাস প্রশ্বাসকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। প্রথমে নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস উভয়েরই সময় এক রাখা হয়। পরে ঐ দুইটি প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক বিভিন্ন নিয়মিত ছন্দ আনয়ন করা হয় এবং মধ্যে একবার শ্বাসকে ধারণ করে রাখা হয়। এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় যেথায় নিঃশ্বাস ধরে রাখার ক্রিয়াটি নিঃশ্বাস লওয়া এবং ফেলার মতনই স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; যদিও প্রথম প্রথম

উহা প্রয়াস-সাধ্য। প্রাণায়ামের প্রথম লক্ষ্য স্নায়ু মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ করা; প্রাণ শক্তিকে বাধা, বিঘ্ন, অনিয়ম থেকে মুক্ত করে স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়ে তাকে চালিত করা; এবং প্রাণশক্তির কার্য্যাবলীর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করা, যার ফলে দেহবাসী মন ও আত্মা আর দেহ বা প্রাণের বশীভূত না থাকে বা উহাদের উভয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের এই ব্যায়াম যে বাধামুক্ত ও পবিত্র স্নায়ুমণ্ডলী গঠন করার ক্ষমতা রাখে তাহা আমাদের শারীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত সত্য। প্রাণায়াম দেহকেও পরিস্কার হতে সাহায্য করে, তবে প্রথম প্রথম দেহের সবগুলি নালী ও রন্ধ্রে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী নয়, সেই হেতু হঠযোগী কয়েকটি বাহ্যিক প্রক্রিয়ারও সাহায্য গ্রহণ করেন যাহা দ্বারা শরীরের পুঞ্জীভূত অপবিত্রতা নিয়মিত ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়। নির্দিষ্ট আসনের দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যাধিকে সারান যায়। বাহ্যিক সাহায্যকারী পদ্ধতি, আসন এবং প্রাণায়াম দেহকে সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্যবান রাখে, এই সমস্ত পরিশুদ্ধির সাহায্যে প্রাণ শক্তিকে দেহের যে কোনও অংশে, যে কোনও ভাবে অথবা দেহের গতিবিধির যে কোনও ছন্দে সঞ্চালিত করা যায় – ইহাই সর্বপ্রধান লাভ। ফুসফুসের মধ্যে নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং ত্যাগ, ইহা হোল আমাদের দেহ যন্ত্রে প্রাণের অর্থাৎ প্রাণবায়ুর একটি সর্বাধিক অনুভূত, বাহ্যিক এবং ধারণাযোগ্য প্রক্রিয়া। যোগ শাস্ত্রে বলা হয় প্রাণের পঞ্চমুখী গতি আছে যাঁহার দ্বারা ইহা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে এবং আমাদের স্থূল দেহে সঞ্চালিত হয় এবং দেহের সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। হঠযোগী শ্বাস-প্রশ্বাসের এই বাহ্যিক প্রক্রিয়াটিকে চাবীকাঠি স্বরূপ ব্যবহার করেন এবং ইহার সাহায্যে তিনি প্রাণের এই পঞ্চশক্তির উপর আধিপত্য লাভ করেন। উহাদের আন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন এবং সমগ্র দেহের জীবন ও ক্রিয়া কর্ম সম্বন্ধে মানসিক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রাণশক্তিতে সব নাড়ী বা স্নায়বিক নালীর মধ্য দিয়ে চালিত করতে পারেন। তিনি দেহের ছয়টি চক্র বা স্নায়বিক গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাণশক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হন, এবং প্রত্যেকটি চক্রে এই শক্তিকে জাগরিত করে তার ক্ষমতাকে বর্তমানের অভ্যাসগত যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার ঊর্ধে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে বলা যায় যে

হঠযোগী দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির উপর পূর্ণ শাসন লাভ করেন, ইহার সূক্ষ্মতম স্নায়বিক ক্রিয়ায় এবং স্থূলতম দৈহিক প্রক্রিয়ায়, এমন কি দেহের সেই সমস্ত ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করেন যারা এখন ইচ্ছার অধীনস্থ নয় এবং যারা আমাদের লক্ষ্যকারী চেতনা এবং ইচ্ছার অন্তর্ভূক্ত নয়। সুতরাং দেহ এবং প্রাণের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব এবং উভয়ের ক্রিয়া কর্মের পরিশুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত মুক্ত অফলপ্রসূ ব্যবহার – ইহাই হঠযোগের উচ্চতর লক্ষ্য হিসাবে স্থাপিত হয়েছে।

ঐ সব কেবল ভিত্তি মাত্র; হঠযোগে ব্যবহৃত দুইটি যন্ত্রের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক স্থূল অবস্থা। মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়াগুলি অধিকতর প্রয়োজনীয় বস্তু এবং তাহাদের দিকে এই যন্ত্র দুটিকে চালিত করা সম্ভব। তা নির্ভর করছে দেহ-মন-আত্মার যোগাযোগের উপর এবং হঠযোগের ভিত্তিস্বরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের সম্বন্ধের উপর; এইরূপে হঠযোগ রাজযোগের নিকটবর্তী হয়, এবং এমন একটি অবস্থা আসে যেথায় একটি থেকে অপরটিতে চলে যাওয়া যায়।

---------- (The synthesis of Yoga, pp.601 to 609)
(শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে)

"ধর্মের নামে আমরা কয়েকটি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ এবং অনুষ্ঠানকে অন্ধভাবে পালন করি মাত্র; সে সবের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের কোনও যোগাযোগ নাই। ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়াই আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষ্য। আর নৈতিকতা গঠিত হয়েছে বাহ্যিক আচার ব্যবহারের কয়েকটি নিয়ম ও বিধি দিয়ে। ভগবানের ইচ্ছাকে সোজাসুজিভাবে জানা এবং আমাদের জীবন ও সকল কর্মে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করাই আধ্যাত্মিকতা। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎভাবে যোগাযোগ না থাকলে আমাদের কামনা-বাসনাসকলকে সম্পূর্ণরূপে সংযত রাখা যায় না। ভগবানের সহিত ঐ যোগাযোগ স্থাপিত করবার জন্য কয়েকটি অনুশাসন পালন করতে হয়। ঐ অনুশাসনকেই ভারতে যোগ সাধনা বলা হয়।" --(অনিলবরণের অভিভাষণ থেকে)

DO NOT COPY

অনুবাদক - শ্রীমৎ স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি

প্রশ্ন - স্বপ্নের কোন তাৎপর্য আছে কি?
উঃ - স্বপ্নের প্রচুর মূল্য আছে। অজ্ঞানীর নিকট সবই অমূলক। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অর্থ আছে সব কিছুরই। জগৎ-প্রপঞ্চ ও মন-বুদ্ধি উভয়েরই অর্থ আছে।

স্বপ্নরাজ্যে জাগ্রত জীবনের পরিসীমা রূপ সব বাধাবিঘ্ন অপসারিত। কারণ আমরা জীবাত্মা; আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত দিব্য ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই শক্তি আমরা প্রয়োগ করি স্বপ্নরাজ্যে। চেতন মনে আমরা যা সৃষ্টি করতে পারিনা স্বপ্নকালে আমরা তা সৃষ্টি করবার সুযোগ পাই অবচেতন মনে। স্বপ্ন থেকে আমরা একটি শিক্ষা পাই যে, মন সর্ব-শক্তিমান এবং এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে মন-বুদ্ধির সংকল্পের দ্বারা। তা না হলে স্বপ্নরাজ্যে মন কিরূপে এ সকল সৃষ্টিও প্রকাশ করত যা'র প্রত্যেকটি দেখতে পাওয়া যায় এই পরিদৃশ্যমান জগতে।

জগতে এমন বস্তু নেই যা' বাস্তব আকারে আমরা সৃষ্টি এবং ভোগ করতে পারি না স্বপ্নরাজ্যে। কিন্তু আমরা যখন জেগে উঠি, দেখতে পাই স্বপ্নের সমস্ত অভিজ্ঞতাই মিথ্যামাত্র; তা' হলে কিরূপে আমরা জানব যে, জাগ্রত অবস্থায় বা বাস্তব জীবনে যা' আমরা দেখছি, শুনছি - তাই সত্য? যখন স্বপ্ন দেখি, পার্থিব জীবন মিথ্যা মনে হয় - আর যখন জেগে থাকি, তখন স্বপ্নকে মনে হয় মিথ্যা। আমরা যেন বিচরণ করছি এক স্বপ্নরাজ্য থেকে অপর স্বপ্নরাজ্যে।

যখন আমাদের কল্পনা খুব গভীর হয় তখনই আসে ভ্রান্তি (hallucination); আর আমরা মনে করি বাস্তবিক কিছু দেখি। ভ্রান্তি ও দিব্যদর্শনের মধ্যে তফাৎ এই যে, ভ্রান্তির কোন অর্থ নেই কিন্তু দিব্য-দর্শনের অর্থ এবং মূল্য উভয়ই আছে।

DO NOT COPY

স্বপ্নের আর একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। স্বপ্ন আমাদের কোন কোন বিষয় ইশারায় দেখিয়ে দেয়, কোন কোন বিষয়ে করে দেয় সতর্ক। আমাদের জানতে হবে মনের বিভিন্ন স্তরে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বপ্ন উৎপন্ন হয় স্বপ্নরাজ্যে। সাধারণতঃ মিথ্যা স্বপ্ন সৃষ্টি করে অবচেতন মন। আর অধিচেতন মন সৃষ্টি করে সু- স্বপ্ন তথা সত্য বিষয়ক স্বপ্ন। অধিচেতন মনের স্বপ্ন বলে দেয় যা' কিছু ঘটবে বা ঘটেছে সেই সত্য সম্বন্ধে। অবচেতন মনের বা চেতন মনের স্বপ্ন কদাচিৎ সত্য হয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে ভাসা ভাসা গোলমেলে ধরণের সন্দেহ ব্যঞ্জক। অবচেতন মনের এই যে সন্দেহ ব্যঞ্জক মিশ্র স্বপ্ন তা আমাদের সাবধান করে দেয় দুঃখ ও ভয়ে মনের পর্দার উপর যে হালকা ও আবছা মানসিক দৃশ্যপট উৎপন্ন হয় তার বিরুদ্ধে।

চিন্তাগুলোই অভিনেতা। এরা কল্পনার রঙ্গমঞ্চে পাখা উড়িয়ে অভিনয় করে। এরা মনের মধ্যে যে অভিনয় করে তাই অভিনীত হয় স্বপ্নরাজ্যে। স্বপ্ন চিন্তার বাস্তব-মূর্ত্তি এবং দিব্য-দৃশ্য কেবল যে মনের মধ্যে চিন্তারাজির বাস্তব মূর্তি তা নয়, পরে তা' জগৎ মঞ্চেও হয়ে থাকে অভিনীত। দিব্য দর্শনে আমরা কোন কোন ঘটনা দেখি, পরে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় এবং জগৎ বাসীও তা' দেখতে পায়।

প্রশ্ন - পদার্থের যথার্থই অস্তিত্ব আছে কি? এরা কিসের তৈরী?

উঃ - মানুষের মনে পদার্থের অস্তিত্ব এবং অনুভূতি উভয়ই আছে। কিন্তু মানুষ তাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা, যুক্তি বিচারের দ্বারা এবং কতকগুলি প্রয়োগের দ্বারা এটা আবিষ্কার করেছে যে, সমস্ত নশ্বর এবং মায়া প্রসূত জাগতিক সৃষ্টির পশ্চাতে বা মূলে রয়েছে শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় সৃষ্টিকারী এক মহতী শক্তি, যেমন দৃশ্যমান একখণ্ড বরফ টুকরোকে রূপান্তর করা যায় সেই অদৃশ্য শক্তিতে। এই সত্যকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি – যেমন সমুদ্রের অস্তিত্বের সত্যতা আমরা জানি যদিও প্রতিটি তরঙ্গের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী, যে তরঙ্গ উদ্বেলিত বিশাল সেই সমুদ্রজাত। তরঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই সমুদ্র ছাড়া কিন্তু তরঙ্গহীন সমুদ্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে। দিব্য-মানসিক-শক্তি বা ব্রহ্মশক্তি ছাড়া বস্তু অস্তিত্বহীন; কিন্তু ব্রহ্মশক্তি থাকতে পারে বস্তু ছাড়াও। এসব ধারণা বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যেতে পারে কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তথা

আত্মিকভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন সাধক আত্ম-শক্তি দ্বারা কোন বস্তুকে চিৎ-শক্তিতে এবং চিৎ-শক্তিকে পরম ব্রহ্মে লীন করার চরম আত্মজ্ঞান লাভ করে। বস্তুতপক্ষে পদার্থের অস্তিত্ব নেই এরূপ আত্মজ্ঞানীদের কাছে; কেননা তাঁরা দেখতে পান সর্বব্যাপী একই অক্ষয় অমর পরমাত্মা রয়েছেন সমস্ত সৃষ্টি-তরঙ্গের অন্তরালে।

সমস্ত পদার্থের উপাদানই হল কম্পন। বিরানব্বইটি (অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে আরও বেশী) মৌলিক ধাতু যা' বিশ্বে উপাদানরূপে প্রবেশ করেছে মহাবিশ্ব থেকে মানবের কাছে, আর বিদ্যুৎ-কণিকা সমূহের বিভিন্ন প্রকারের কম্পন বই কিছুই নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ - বরফ অতি শীতল; এর ওজন আছে; আছে আকার এবং এ চোখে দেখা যায়। অগ্নিসংযোগে গলে পরিণত হয় জলে। জল তড়িৎ-চালনা দ্বারা বিশ্লেষণ করলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন রূপ মৌলিক উপাদানে পরিণত হয় এবং এরা বিদ্যুৎ কণিকার কম্পন বই কিছু নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা যায়, বরফ অস্তিত্বহীন যদিও বরফ সকলেরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যেমন বরফ দেখা যায়, স্বাদ গ্রহণ করা যায়, স্পর্শে অনুভব করা যায় এর শৈত্য ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এর সত্তা নিহিত রয়েছে অদৃশ্য ইলেকট্রন প্রোটনে, বা ধনাত্মক ঋণাত্মক বিদ্যুৎ কণিকায়, অথবা বলা যায় অদৃশ্য শক্তিতে। অন্য কথায় বলা যায়, যাকে অদৃশ্যে বিলীন করা যায়, তার অখণ্ড বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই যুক্তিতে বলা যায় পদার্থ অস্তিত্বহীন। কিন্তু এটা সত্য শুধু এই যুক্তিতেই, কারণ বস্তুর আপেক্ষিক অস্তিত্ব রয়েছে ; অর্থাৎ মনের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু বর্তমান। আরও বলা যায় বস্তু অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি তথা জ্যোতির ঘনীভূত অবস্থা বা স্থূল-প্রকাশ এবং সেই শক্তি অস্তিমান কারণ অক্ষয় এবং অমর। সুতরাং বস্তুও বিদ্যমান।

যেমন সন্তানের উৎস পিতামাতা তেমনি পদার্থের অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল। এর সৃষ্টি ব্রহ্মার দিব্যমনে এবং এ প্রত্যক্ষীভূত হয় জীব-মনে। মনের অতীত বস্তুর কোন অস্তিত্বও নেই, সত্যতাও নেই। হিন্দু দর্শন তথা সনাতন দর্শন অনুসারে জগৎ এবং ব্রহ্মার লক্ষণ এর সেতু বন্ধন করছে মহাশক্তি। তদ্রূপ বরফ

এবং অদৃশ্য বাষ্পের সেতুস্বরূপ হচ্ছে জল। জল এবং বরফ উভয়েই অদৃশ্য বাষ্পের ক্ষণস্থায়ী স্থূলরূপ। অনুরূপে জীবের চেতন মন এবং উভয়েই চৈতন্য সত্তার স্থূলরূপে বহিঃপ্রকাশ। বস্তুতপক্ষে, একমাত্র ব্রহ্মশক্তি-ই নিত্য।

প্রশ্ন - আপনি কি মনে করেন ইহ জীবনের পর পর-জীবন আছে?
উঃ - এটা সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, মৃত্যুর পরও জীবন অবিরাম স্রোতে প্রবহমান থাকে। উদ্দেশ্য আমাদের জীব-চৈতন্যকে ব্রহ্ম-চৈতন্যে মিলন; তথা একই জীবন-সূত্র, একই নিয়ম, একই ছন্দ, একই বোধ-সত্তা খুঁজে বার করা যাতে সকলকে মহামিলনের দ্বারা একতাবদ্ধ করা যায়, বা সত্তায় আনা যায়। ব্রহ্ম চির নতুন, অনুচ্ছিষ্ট; সুতরাং ব্রহ্ম রুদ্ররূপে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন যাদুদণ্ড দ্বারা মৃত্যুরূপ করাল গ্রাসে গ্রাস করে আবার সৃষ্টিকারী ব্রহ্মারূপে সব ব্যক্ত করান, নবরূপে পুনর্গঠিত করান, সৃষ্টিকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে নব নব রূপে সাজান।

এখানে জীবন আপেক্ষিক। কতকগুলো জীবন তরঙ্গ আপেক্ষাকৃত বেশীদিন থাকে; কিন্তু এদের প্রত্যেককেই বিভিন্নভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হয় এক পরমাত্মাকেই। এদের সকলেরই উৎপত্তি এবং লয় ব্রহ্ম সাগরে। তারকার ক্ষুদ্র ধূলিকণা, সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, রামধনু, ঊর্ণনাভের সূক্ষ্মসূত্র, রাতের পাখী পাপিয়া সকলের প্রকাশিত মৌন-পরমব্রহ্ম দ্বারা।

জীবন জড় চেতন রূপে নিদ্রিত থাকে জড়ে; পুষ্পেতে থাকে সুখময় স্বপ্নাবস্থায় অর্থাৎ উদ্ভিদে প্রাণ স্পন্দন স্পষ্ট; পশুতে জেগে উঠে প্রাণশক্তি নিয়ে, আর অসীম সম্ভাবনা নিয়ে সচেতন মনন শক্তি সহযোগে প্রকাশ পায় মানুষে। পরমাত্মা কোটি কোটি পুষ্প রাজি তথা জীবে অভিব্যক্ত হন সসীমরূপে। মৃত্যুর বাহ্য ব্যাপার, অথবা পরিবর্ত্তনশীলতার বিভ্রান্তি প্রতিফলিত হয় সমস্ত অনিত্য বস্তুতে; তা না হলে পরমাত্মাই সীমাবদ্ধরূপে পরিগণিত হত এবং সীমাবদ্ধ অনিত্য বস্তু দ্বারা তাঁর পরিমাপ করা সম্ভব হত। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম তাঁর অসীমত্ব হারিয়ে হতেন সসীম, সুনির্দিষ্ট, পরিবেষ্টিত তথা আকার বিশিষ্ট।

DO NOT COPY

মৃত্যু একটি দিব্য চুল্লি যাতে সমস্ত বস্তুর তথা প্রাণীর কর্মফল জনিত আবর্জনা পরিশোধন করা হয়। যথাযথ কর্ত্তব্যরত প্রাণীর ক্ষেত্রে মৃত্যু আসে একে উন্নতস্তরে উন্নীত করার জন্য। আর অসফল প্রাণীর কাছে আসে তাকে আরও একবার সুযোগ দেওয়ার জন্য অন্য পরিবেশে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন মৃত্যু অশেষ গুণে নিরাপদ আশ্রয়। পরমাত্মাকে প্রকাশ করবার জন্য যখন প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি মানুষ তার সুনির্দিষ্ট কর্মভোগ সমাপন করে তখন আসে স্বাভাবিক মৃত্যু। যখন অপরিণত মৃত্যু কোন তরুণকে গ্রাস করে তখন বুঝতে হয়, সে তার রুগ্ন দেহকে পরিবর্ত্তন করে কোথাও অবস্থান করছে ভাল সুযোগের অপেক্ষায়।

তাই আমরা দেখি সুন্দর গোলাপ এবং গৌরবময় যুবক, পরমাত্মার কিছু গুণ অভিব্যক্ত করে শান্ত তরঙ্গ রূপে বিলীন হয়ে যায় অনন্ত জীবন সমুদ্রে। নবজীবনের রঙ্গমঞ্চে নতুন অভিনয়ের জন্য জীবাত্মারূপ অভিনেতাকে নতুন সাজে সাজিয়ে দেয় মৃত্যু। সর্বোপরি অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবর্ত্তিত বাসস্থানেও অবস্থান্তরের জন্য মৃত্যু একটি উপায়। যাঁর দিব্য জ্ঞান লাভ হয়েছে তিনি দেখতে পান যে জাগতিক জীবন অবসানে নতুন দিব্য জীবনের সূত্রপাত হয়।

প্রশ্ন - অলীক কল্পনা (Hallucination) কোন বাস্তব সত্য বলে মনে হয়?
উঃ - যখন তুমি একটি ঘোড়া অথবা একটি বাড়ীর কল্পনা কর, তখন তুমি তা' বাস্তবে দেখতে পাও না। কিন্তু সেই চিন্তন যখন ঘনীভূত হয়, তখন তা স্বপ্নে দেখতে পাও অবচেতন বা অচেতন অবস্থায়। যখন তুমি কোন বস্তুতে বা বিষয়ে গভীরভাবে মন একাগ্র কর জাগ্রত অবস্থায়, তখন তুমি সেই বস্তু প্রথমে মুদ্রিত নয়নে দেখতে পাও এবং পরে দেখতে পাও খোলা চোখে। কোন বস্তুতে মন একাগ্র করলে যদি তা বন্ধ অথবা খোলা চোখে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে একাগ্রতার জন্মেছে উৎকর্ষতা। অপরপক্ষে, কোন বস্তুকে যদি দেখতে শুরু কর বন্ধ অথবা খোলা চোখে জাগ্রত অবস্থায়, অথচ তা দেখতে চাও না, তবে এ অবস্থাকে বলা হয় 'Hallucination' এবং তা নিশ্চিতই পরিহার করা উচিত।

যদি তুমি বোধ কর যে, চোখ বন্ধ অবস্থায় চিন্তা করলে কোন সাধুর মূর্তি

দেখতে পাও, তবে একাগ্রতা আরও বর্দ্ধিত করার ফলে খোলা চোখে যেমন সিনেমায় দেখা যায় সেরূপ রক্ত মাংসহীন ছবি দেখতে সমর্থ হবে। তোমার একাগ্রতা যদি চরমে পৌঁছায় এবং তুমি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে একই তানে অবস্থান কর, তবে তুমি সমস্ত মহান পুরুষদেরই যাঁদের তুমি দেখছ, রক্ত মাংসযুক্ত শরীরেই দেখতে পাবে এবং স্পর্শ করতে পারবে তাদের দেহ। একাগ্রতার এ-ই চরম উৎকর্ষতা। তবে 'Hallucination' (অলীক কল্পনা) এবং স্বপ্নের মধ্যে যেন তালগোল পাকিও না। প্রধান পার্থক্য হল - Hallucination এর যুক্তি সংক্রান্ত কোন অর্থ নেই, আর স্বপ্নের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

সাধক রাজা রামকৃষ্ণ **শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ**

রাজশাহী জেলার আটগ্রাম নামক পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে সাধক রাজা রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এনার পিতা হরিদেব রায় ঐ গ্রামের মধ্যে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

রামকৃষ্ণ রায় নাটোর রাজবংশের জ্ঞাতি সন্তান। নাটোরের রানী ভবানী ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর ছিল প্রচুর বিষয় সম্পত্তি। সেগুলি কে দেখবে? লোকজন নেই। তাই তিনি রামকৃষ্ণ রায়কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। স্থির করলেন রামকৃষ্ণকে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে বড় করে তুলবেন। সে নাটোরের জমিদারী দেখাশোনা করবে। আর উনি স্বচ্ছন্দে কাশীতে দিন কাটাবেন। ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকবেন।

দিনের পর দিন রামকৃষ্ণ বড় হতে লাগলেন। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করলেন। ওদিকে রাজৈশ্বর্যের মধ্যে নানারকম ভোগ বিলাসের সুখ রয়েছে। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই কুমারের। তাঁর মন যেন উদাসীন উন্মনা।

DO NOT COPY

রাণী ভবানী কুমারের মন মেজাজ দেখে বিষণ্ন হলেন। গুরুদেবকে ডাকলেন। গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশ অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি কুমারকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে রাণীমাতাকে বললেন, এনার বিবাহের ব্যবস্থা করুন। তার সঙ্গে ইনি যাতে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারেন সে ব্যবস্থা করবেন। দুটো কাজ সমানে চললে তবে এনার জীবনে উন্নতি দেখা দেবে।

গুরুদেবের কথাই রাখলেন রাণী ভবানী। কুমারের বিয়ে হল। তার সঙ্গে হল দীক্ষা। রঘুনাথ মন্ত্র দিলেন। তবে নিজে দিলেন না। রাণী ভবানীর মুখ দিয়ে বলালেন। রাণী ভবানীই হলেন রামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু। কিছুদিন পরে রাজা রামকৃষ্ণের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। তাতেও সংসারের প্রতি তাঁর মায়া এতটুকু বাড়লো না।

সুন্দরী স্ত্রী, শিশুপুত্র, ভোগ বাসনা, ঐশ্বর্য - এসব কোনটিই তাঁর মনে সুখ দিতে পারলো না। তাঁর মন দিনরাত্তির ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো। মাঝে মাঝে তিনি বাগসরের শ্মশানে চলে আসতেন। কখনো বা জয়কালীর মন্দিরে যেতেন।

নাটোরে জয়কালী খুব জাগ্রতা। রামকৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন। কখনো মায়ের ধ্যানে তন্ময় হতেন, কখনো মাকে ষোড়শোপচারে পুজো করতেন। রাজকাজের চাইতে মাতৃপূজা তিনি ভালবাসতেন।

এই সময়ে একজন শক্তিমান কৌলাচার্য্যের আবির্ভাব হয় নাটোরে। রাজা রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে শব সাধনা শিখে নেন। তারপর ভবানীপুরের শক্তিপীঠে গিয়ে প্রায়ই ধ্যানে বসতেন। মন্দিরের কাছে একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তুত করান। প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় সেখানে বসে সাধনা করতেন।

একবার জয়কালী মন্দিরের ভেতরে সাধনায় মগ্ন আছেন রাজা রামকৃষ্ণ। এমন সময় জটাধারী এক সাধু এসে তাঁকে ডাকলেন। রামকৃষ্ণর বাহ্যজ্ঞান ছিলো না। মাতৃভাবে তন্ময় চিত্ত। সাধু রাজাকে আহ্বান জানিয়েও সাড়া পেলেন না। তাই চলে গেলেন।

যাবার সময় রাজাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, রাজা রামকৃষ্ণ ধিক তোমায়। এমন করে তুমি আপনাকে ভুলে আছ কেন? একবার ভেবে দ্যাখো তুমি কে ছিলে! পুর্বজন্মের কথা একবার ভাবো। মায়ার বন্ধন মুছে ফেল।

সন্ন্যাসীর কথা রাজার কানে কিছু কিছু প্রবেশ করলো। এবার তাঁর ধ্যান ভাঙলো। ছুটে গেলেন তাঁকে দেখবার জন্যে। দেখলেন, সন্ন্যাসী নেই। তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। তখন রামকৃষ্ণ বুঝলেন নিজের ভ্রম।

এখন থেকে তাঁর মনে আসতে লাগলো তীব্র বৈরাগ্য। রাজকাজে এতটুকু মন বসছে না। কিছু কিছু সম্পত্তি ও টাকাকড়ি অকাতরে গরীব-দুঃখীদের দান করলেন। এতে রাজকর্মচারীগণ বা রাণীমা বিশেষ খুশী হতে পারলেন না। রাজার এই দয়ার ঘটা দেখে তাঁরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন।

সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেলেন না বটে কিন্তু সেদিন থেকে তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গেল। তিনি বিষয়কাজ ছেড়ে দেবমন্দিরে অধিক সময় কাটাতে লাগলেন। কখনো মুর্শিদাবাদস্থিত বরানগরের কিরিটেশ্বরীর মন্দিরে, কখনো ভবানীপুরের পীঠস্থানে সাধনা করতে লাগলেন।

ভবানীপুরের পীঠস্থানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনা করার সময় রাজা রামকৃষ্ণ আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎলাভ করেন। এতদিনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। নিজের ইষ্টের দেখা পেলেন। জীবন হল সার্থক। সিদ্ধিলাভ করলেন সাধনায়। পেলেন এক নতুন জীবন।

রামনবমী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে ভবানীপুর পীঠে। রাজা রামকৃষ্ণ ভক্তিভরে পূজো করলেন। দেবীকে সুন্দর ভূষণে সাজানো হয়েছে। চারদিকে মহোৎসব লেগে গেছে।

অমাবস্যার রাত্রি। মধ্যরাত্রে মায়ের পুজো হবে। পুজো হতে কিছু সময় দেরী আছে।

রাজা রামকৃষ্ণ মন্দিরের বাইরে বসে আপনার মনে গান গেয়ে চলেছেন –

‘ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী-কথা বিনা না শুনে কানে। .....’

গান গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে গেছেন রাজা রামকৃষ্ণ। বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা। ওদিকে ডাকাতদল ছুটে আসছে মন্দিরের দিকে মায়ের অলঙ্কার লুট করতে।

মন্দির অরক্ষিত। কেউ নেই মায়ের অলঙ্কার রক্ষা করবে শত্রুদের হাত থেকে। প্রহরীরা অন্যত্র চলে গেছে। রামকৃষ্ণ একা রয়েছেন মন্দিরের সামনে। ডাকাতদল মন্দিরের সামনে এসে দেখে, সাধক রামকৃষ্ণ আপন মনে গান গাইছেন। আহা, কি মধুর গান! অতিবড় পাষণ্ডের প্রাণ গলে যায় ঐ গানে।

ডাকাতদলের লোকজন ঐ গান শোনার পর দস্যুবৃত্তি ভুলে গেল। লজ্জায় গা ঢাকা দিয়ে অন্যত্র সরে পড়লো। সাধক রামকৃষ্ণ আপন মনে গেয়ে চললেন –

কার রমণী সমরে বিরাজে
কে লো লজ্জারূপা দিগম্বরী
অসুর সমাজে?
মায়ের পদতল বরণ
জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে।

এমনিভাবে রামকৃষ্ণের সাধন শক্তির প্রভাবে ডাকাতদল বহুবার মন্দির আক্রমণ করতে এসে পেছ-পা হয়েছে। ফিরে গেছে বিফলমনোরথ হয়ে।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই আপ্তকাম তন্ত্র-সাধকের ইহলীলা সাঙ্গ হল।

DO NOT COPY

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রী প্রণব ঘোষ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি উত্তর প্রদেশে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে বৃত ছিলেন। তাঁহারই স্থাপত্য কৌশলে বেলুড় মঠের মূল গৃহ মন্দিরের গর্ভগৃহ নির্মিত হয়। বিবেকানন্দ মন্দিরও তাঁহার কীর্তি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। স্বামীজী বিজ্ঞানানন্দকে খুব ভালোবাসিতেন এবং 'পেসন' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার 'বিজ্ঞানানন্দ' নামও স্বামীজীর দেওয়া। স্বামীজীর নির্দেশে তিনি শ্রীশ্রী ঠাকুরের সম্মুখে যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দও স্বামীজীকে খুব ভালবাসিতেন, তবে ভয়ও করিতেন। স্বামীজীকে বিরক্ত দেখিলে তিনি সাধারণতঃ কাছে ঘেঁসিতে চাহিতেন না। ডাকিলেও বলিতেন, "এখন ব্যস্ত আছি, পরে আসব।" একবার স্বামীজীর গালাগালির ভয়ে তিনি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কলিকাতার বলরামবাবুর বাড়িতে থাকিবেন মনে করিয়া একটি চলতি নৌকা ধরেন। স্বামীজী উপর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পেসন, যেও না, যেও না, তুমি রাজার কাছে যেও না – রাজা খুব ভালো লোক নয়।" বিজ্ঞান মহারাজ অবশ্য সে ডাকে সাড়া দেন নাই। তিনি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "আমি কি আর শুনি? তখনই নৌকায় চড়ে তার ছইয়ের নীচে গিয়ে বসলাম।"

স্বামীজীকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন তাহা জিজ্ঞাসা করায় একবার বলিয়াছিলেন, "বাপ, তাঁর সামনে এগোয় কে? আমরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করতাম। আগুনের কাছে গেলে যেমন আঁচ লাগে, তাঁর কাছে গেলেও ঐরূপ আঁচ অনুভব করতাম। তিনি মঠে উপস্থিত থাকলে মঠের ঐ গেট থেকেই তা বোঝা যেত। সারা মঠ তখন গম গম করত। আবার তিনি উপস্থিত না থাকলে মঠের অন্য রূপ।" স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এই তেজ ও শক্তি কোন সাধারণ ব্যাপার নয়, দৈবশক্তি বিশেষ, অন্তত বিজ্ঞান মহারাজের কথায় তাই মনে হয়। তিনি জনৈক ভক্তকে

একবার বলিয়াছিলেন, স্বামীজী, মহারাজ, এঁরা কত গভীর ছিলেন, তাঁদের বুঝবার শক্তি কোথায় আমাদের? একদিন স্বামীজী পায়খানায় যাচ্ছেন আমার ঘরের সামনে দিয়ে, আমার ইচ্ছে হল তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করি। যেই পায়ে হাত দিয়েছি অমনি তীব্র শক্ লাগল। চমকে উঠে হাত তুলে নিলাম। স্বামীজী হাসতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে পেসন, হলো কি?" বিস্ময়ে আমি বললাম, এ যে মশায় ইলেকট্রিক শক! স্বামীজী উত্তরে বললেন, "আমেরিকায় সব খরচ হয়ে গেছে রে! ওখানে আরও জ্বলন্ত ছিল।"

আর একটি অলৌকিক ঘটনার কথাও বিজ্ঞান মহারাজ বলিয়াছেন-- "স্বামীজীর নির্দেশে গঙ্গার ধারে পোস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। দুপুরে ভাঁটার সময়ে বিজ্ঞান মহারাজ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কাজ তদারকি করিতেছেন। জোয়ার আসিবার আগেই কাজ শেষ করিতে হইবে, তাই পিপাসায় গলা শুকাইয়া গেলেও তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। স্বামীজী তখন অসুস্থ। চিকিৎসকের নির্দেশ মত সবে বরফ দিয়া দুধ খাইয়াছেন। হঠাৎ পোস্তার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি সেবককে শূন্য পাত্রটি দিয়া বলিলেন, "পেসনকে দিয়ে দে!" গ্লাসটি পাইয়া বিজ্ঞান মহারাজ ভাবিলেন, স্বামীজী ঐ অবস্থাতেও ব্যঙ্গ করিতেছেন। তথাপি প্রসাদ গ্রহণ করা উচিৎ মনে করিয়া তিনি অবশিষ্ট দুই চারি ফোঁটা যাহা ছিল তাহাই পান করিলেন। এইবার তাঁহার আশ্চর্য হইবার পালা। তাঁহার মনে হইল যেন মুখে সুধা ঢালিয়া দিল। পিপাসা দূর হইয়া গেল এবং শরীর স্নিগ্ধ হইল।

স্বামীজীর দিব্য সত্তা সম্পর্কে বিজ্ঞান মহারাজের কোন সন্দেহ ছিল না। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরও তিনি স্বামীজীর উপস্থিতি অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন, "এখনও তাঁর ঐ ঘরটিতে রয়েছেন। তাই ঐ ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি অতি সন্তর্পনে যাই, পাছে তাঁর ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটে। তাঁর শরীর থাকতে একদিন ঐ ঘরে বসে ধ্যান করতে দেখেছিলাম। সে সময় তাঁর শ্রী অঙ্গের জ্যোতিতে সমস্ত ঘরটি আলোকিত দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম --- তিনি কি সাধারণ মানুষ?"

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও অনেকেই তাঁহার দর্শন পাইতেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দও পাইয়াছেন। স্বামীজীর এই নিত্য লীলার একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। বেলুড়ে ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সময় দেখা যায় বিজ্ঞান মহারাজ উপরের দিকে তাকাইয়া গদ্ গদ্ স্বরে বলিতেছেন, "স্বামীজী, তুমি বলেছিলে যখন শ্রীশ্রী ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ হবে, পেসন, তখন আমি হয়ত আর এ শরীরে থাকব না, কিন্তু ওপর থেকে তা আমি দেখব। আজ তো ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, স্বামীজী, ওপর থেকে তুমি তা দেখ।" উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ পরে বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনি কি সত্যই স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ ভাই, শুধু স্বামীজী কেন, শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রী মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ করে গিয়েছেন। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েই তো কাজ আরম্ভ করেছি।"

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনও বিজ্ঞান মহারাজ অনুরূপ ভাবে স্বামীজীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। পূজা, ভোগ নিবেদন, এবং আরতি সমাপ্ত হইলে তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া স্বামীজীকে স্মরণ করিয়া বলেন, "স্বামীজী, আপনি উপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন; আজ দেখুন আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নূতন মন্দিরে বসেছেন।" তারপর তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাঁড়াইয়া আছেন।

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচরণগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।"

--- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পূর্বজের ঋণ

সুনন্দন ঘোষ

এ'দেশ দশ হাজার বছরের প্রাচীন নৌকো —
তার একটা দাঁড় এখন ক্যাথলিক রমণীর হাতে।
আমেরিকায় সওদা হয় এ'দেশের মেধা।
ইউরোপ থেকে আমদানী হয় বিপ্লব চেতনা।
এক গলুইয়ে লাল দানবের আগ্রাসন, অন্য গলুইয়ে সবুজ যবনের অন্তর্ঘাত।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র, সুভাষ ----
পূর্বজেরা দীপ জ্বালাতে এসেছিলেন অন্ধকারে,
তাদের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ করেছিল রক্ষণশীল অর্থবানের জোট।
বিদ্যাহীনেরা তল খুঁজেছিল বিদ্যাসাগরের,
বিবেকহীনেরা চরিত্র খুঁজেছে বিবেকানন্দের।

শতাব্দীর ব্যবধানে সেদিনের
বুদ্ধিজীবিরা আজ ভাতাজীবি।
বিধবা ভাতা, বার্দ্ধক্য ভাতা, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক,
চাষী শ্রমিকের মাথার উপরে চাল নেই, নেতা আছে --।
পার্টি---- নোট ---- বারুদ ---- বান্ধবী -----
পনেরোই আগষ্টের পরের সকালে
রাস্তায় গড়াগড়ি দেয় এঁটো প্লেট আর কাগজের তিরঙ্গা।

এখন প্রায়শ্চিত্তের কাল!
ঘাম আর রক্তে পূর্বজের ঋণ শোধ হলে
লেখা হবে নতুন দিনের ইতিহাস।

DO NOT COPY